

রবীন্দ্রসংগীতের পাণ্ডুলিপি : রূপে রূপান্তরে

অভীক সরকার

গবেষক, সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে জানতে গেলে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির পর্যালোচনা অনস্বীকার্য। মুদ্রিত গ্রন্থে লেখককে আমরা যতখানি পাই তার চেয়ে অনেক বেশি পাই তাঁর পাণ্ডুলিপির মধ্যে। কারণ, একটি গল্প বা একটি কবিতা বা একটি গানের আবির্ভাবের দ্বিধা, সংশয়, আনন্দ—সমস্তটা ধরে রাখে পাণ্ডুলিপি, ইতিহাসের মতো করে। রবীন্দ্রনাথ বহুবার নিজের লেখা বদল করেছেন, বার বার নতুন করে গড়েছেন, আর সেই নতুন প্রচেষ্টা হয়ে উঠেছে নব নির্মাণ। কিন্তু নির্মাণের পেছনে আছে দীর্ঘ প্রচেষ্টার দীর্ঘ ইতিহাস। লেখকের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন সম্পাদনার নিয়ম অনুযায়ী তার নানান পরিবর্তন ঘটে, কখনো লেখকের নির্দেশে, কখনো আবার সম্পাদকের ভূমিকায়। পাণ্ডুলিপির পাতা থেকে গ্রন্থের পাতায় মুদ্রিত হবার এই যাত্রা যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি পায় রবীন্দ্র-রচনার ক্ষেত্রে। তাঁর অধিকাংশ সৃজনই বহুল পরিমার্জিত। গানের ক্ষেত্রটি আরও জটিল ও বৈচিত্র্যময়।

রবীন্দ্রসংগীত ভাব অনুযায়ী, বিষয় অনুযায়ী, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য। আবার প্রয়োগের ক্ষেত্র অনুযায়ী অনেক সময় একই গানের ভাব বা বিষয়ে কিছুটা হলেও মাত্রা পরিবর্তিত হয়। কখনো রবীন্দ্রনাথ বাণীর নির্মাণে এক পাণ্ডুলিপি থেকে অপর পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, কখনও আবার দেখা যায় পাণ্ডুলিপি থেকে বইয়ের পাতায় প্রকাশিত হওয়ার সময় পঙ্ক্তি, স্তবক, পর্ব, শব্দ, যতি প্রভৃতির ব্যবহারে তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ কখনো পঙ্ক্তির অদল বদল ঘটে, কখনো নতুন পঙ্ক্তির সংযুক্তি হয়।

তাঁর গানের ছন্দের ক্ষেত্রটিও যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। কোনো একটি গান কাব্য হিসেবে পাঠ করলে যে ছন্দ পাই, সে গানই গীত আকারে পরিবেশনের সময় তার ছন্দ-বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়। কোনো কোনো গানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেই গানগুলির সুরান্তর রয়েছে। সেক্ষেত্রে সুরান্তর অনুযায়ী গানের ছন্দও পরিবর্তিত হয়। এই ছন্দের পরিবর্তনের পটভূমিটি অনুধাবন করা পাণ্ডুলিপির সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভব। অনেক গানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্বরলিপিতে তা নির্দিষ্ট তালে আবদ্ধ। কিন্তু গানগুলি গাইবার সময় তার তালবাদ্যহীন-প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, যার অনুষঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের পাণ্ডুলিপিগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় একই গানের একাধিক পাণ্ডুলিপি বর্তমান। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, ‘খোলো খোলো দ্বার’ গানটিকে। এই গানটি ‘রাজা (দ্বিতীয় সংস্করণ) এবং ‘অরুণপরতন’ (দ্বিতীয় সংস্করণ) দুটি নাটকেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বিষয় অনুযায়ী গানটির ব্যবহারের অবস্থানগত এবং চরিত্রগত পরিবর্তন করা হয়েছে। ‘রাজা’ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে গানটি রয়েছে রাজা চরিত্রের কণ্ঠে, এখানে গানটির কিছু অংশের পাঠ আছে এই রকম--

‘ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,

সেজেছ কি শুচি দুকূলে ?

বেঁধেছ কি চুল ? তুলেছ কি ফুল ?

গেঁথেছ কি মালা মুকুলে ?’^১

অন্যদিকে ‘অরুপরতন’ (দ্বিতীয় সংস্করণ) নাটকে এই গানটিই ব্যবহৃত হয়েছে সুরঙ্গমা চরিত্রের কণ্ঠে। সেখানে গানটির পাঠ হল—

‘ভরি লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি

সেজেছি তো শুচি দুকূলে,

বেঁধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল

গেঁথেছি তো মালা মুকুলে।’^২

লক্ষণীয়, যেহেতু গানটি ‘রাজা’ (দ্বিতীয় সংস্করণ) নাটকে পুরুষ কণ্ঠ থেকে ‘অরুপরতন’-এ (দ্বিতীয় সংস্করণ) নারী কণ্ঠে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাই ‘এনেছ’, ‘সেজেছ’, ‘বেঁধেছ’, ‘গেঁথেছ’ শব্দগুলি পাল্টে গিয়ে হয় যথাক্রমে, ‘এনেছি’, ‘সেজেছি’, ‘বেঁধেছি’, ‘গেঁথেছি’। আবার এই ‘রাজা’ (দ্বিতীয় সংস্করণ) নাটকের ‘আজি দখিন-দুয়ার খোলা’ গানটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গানটি Ms.^৩ 427(ii) (পৃষ্ঠা ৭৮) পাণ্ডুলিপিতে রচিত, সেখানে গানের আরম্ভ হয় ‘ওগো দখিন দুয়ার খোলা’-এইভাবে। কিন্তু ‘রাজা’ নাটকের পাণ্ডুলিপি তে গানটির আরম্ভ অংশ হল, ‘আজি দখিন দুয়ার খোলা’। এই গানেরই আবার একটি অংশ Ms. 427(ii) সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পাঠে দেখা যায়, প্রথমে ছিল, ‘নব শ্যামল কেতন রথে’ কিন্তু, ‘রাজা’ নাটকের পাণ্ডুলিপিতে সেই লাইনে ‘কেতন’ শব্দটি পরিবর্তন করে ‘শোভন’ লেখা হয়েছিল। বর্তমান ‘গীতবিতান’ ও ‘রাজা’ (দ্বিতীয় সংস্করণ) নাটকে শেষোক্ত পাঠটিই পাওয়া যায়। অন্যদিকে এই গানেই Ms. 427(ii) সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে আছে ‘এস বকুল বনের পথে’, যা ‘রাজা’ নাটকের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লেখা হয়েছিল ‘এস বকুল কানান পথে’। কিন্তু উক্ত পাণ্ডুলিপিতেই দেখা যায়, ‘কানান’ শব্দটি সংশোধন করে তার জায়গায় ‘বিছানো’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই পাঠটিই প্রথম প্রকাশিত ‘রাজা’ নাটকে ও তার প্রথম সংস্করণে এবং ‘গীতবিতান’ (অখণ্ড)-এ রক্ষিত হয়েছে। ‘রাজা’ নাটকের Ms.143-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে (পৃষ্ঠা ৯) ‘এস পাগল হাওয়ায় দেশে / মৃদু মন্দির মধুর হেসে’ ‘রাজা’র Ms.148-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে (পৃষ্ঠা ৪-৫) উক্ত পঙক্তির এবং শব্দের অবস্থানগত পরিবর্তন করে করা হয়েছে, ‘মৃদু মন্দির মধুর হেসে / এস পাগল হাওয়ার দেশে’। অন্যদিকে, Ms.427(ii) সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে ছিল, ‘এস পাগল হাওয়ার মাঝে / এস নবীন বরের সাজে’ পরবর্তীতে এই পাণ্ডুলিপিতেই ওই পঙক্তির ওপর দিয়ে গাঢ় কালি দিয়ে লেখা হয়েছে, ‘মৃদু মন্দির মধুর হেসে / এস পাগল হাওয়ার দেশে’।

উক্ত ‘খোলো খোলো দ্বার’ এবং ‘আজি দখিন দুয়ার খোলা’ গান দুটির সূত্র ধরেই এর পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রকাশিত গ্রন্থের বানানের পাঠগত পরিবর্তনের দিকটিও তুলে ধরা যেতে পারে। ‘রাজা’ নাটকের Ms.143-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত ‘এস’ বানানটি এর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থেও ‘এস’ রক্ষিত আছে কিন্তু তার বর্তমান সংস্করণে এবং অখণ্ড ‘গীতবিতানে’ (পৌষ ১৪০৪) তা পাল্টে ‘এসো’ করা হয়েছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে পাণ্ডুলিপি ভেদে একই গানের বহু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এক্সপ্রেশন-এর বৈচিত্র্য সহজবোধ্য হয় এই যতিচিহ্নগুলির প্রয়োগ লক্ষ করে। একই গান কখন কোন ভাব অনুযায়ী গাওয়া হবে, কখন নাটকের গান হিসেবে গাওয়া হবে আর কখন স্বতন্ত্র ভাবে গাওয়া হবে তা বুঝিয়ে দেয় এই যতিচিহ্নগুলির পরিবর্তন।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাড়াও এমন কিছু পাণ্ডুলিপি রয়েছে যা অন্যের দ্বারা অনুলিখিত। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর অনুমতিক্রমেই এই পাণ্ডুলিপিগুলি অনুলিখিত হয়েছে। কাজেই গবেষণার ক্ষেত্রে এদের গুরুত্বও সমান। রবীন্দ্রনাথ সংশোধন, বর্জন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে তাঁর রচনাগুলিকে পরিপূর্ণ রূপদানের চেষ্টা করেছেন বারংবার, এই অনুলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। এ প্রসঙ্গে একটি গানের কথা আলোচনা করা যেতে পারে---

‘তুমি কি কেবলই ছবি’ গানটির চারটি পাণ্ডুলিপি- Ms.131 (গীতালি, ফাল্গুনী, বলাকা, শোধবোধ) পৃষ্ঠা ৮৭; MsF বলাকা, পৃষ্ঠা ৪; Ms65(1) (শাপমোচন), পৃষ্ঠা ৭; Ms.252(সিংহলে শাপমোচন) পৃষ্ঠা ১৩। এর মধ্যে Ms.131 এবং MsF বলাকা-তে রচনাটির যথাক্রমে একশত আট এবং একশত সাত পঙ্ক্তির দীর্ঘ কবিতারূপটি রয়েছে। আবার Ms.65(1) অর্থাৎ ‘শাপমোচন’-এর পাণ্ডুলিপিতে রচনাটি উনিশ পঙ্ক্তির গানে রূপান্তরিত হচ্ছে। অন্যদিকে Ms.252 সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লিখিত নয়, অন্যের দ্বারা অনুলিখিত ‘শাপমোচন’-এর মধ্যে অভিনয়ের খসড়া খাতা। অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি হলেও তাতে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে সংশোধন, পরিমার্জনের চিহ্ন লক্ষণীয়। গানের পাঠের ওপরের অংশে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় ‘কানাড়া’ রাগের উল্লেখ দেখতে পাই। ফলত লক্ষ করা যাচ্ছে যে কিছু গানের ক্ষেত্রে তার সুরের অনুষ্ণ পাণ্ডুলিপির পাতাতেই পাওয়া যেতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্র সংগীতের পাণ্ডুলিপিগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে- এক, রবীন্দ্র-কৃত পাণ্ডুলিপি এবং দুই, অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি। প্রথমটির ক্ষেত্রে কবি নিজের হাতেই পাণ্ডুলিপির সৃজন এবং তার পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিমার্জন ইত্যাদি করেছেন এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অন্যের হাতে কপি করা রবীন্দ্রসংগীতের পাণ্ডুলিপিতে কবি কেবলমাত্র পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজটি করেছেন। একটি নির্দিষ্ট গানের যখন একাধিক পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হয় তখন তার থেকে কবির শিল্পীসত্ত্বার ধারণাটি স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ, ঐ নির্দিষ্ট গানটির আলাদা আলাদা পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে যে, সে গানটিকে কবি বার বার ভেঙে-গড়ে কিভাবে গানটির চূড়ান্ত রূপ দান করছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত রবীন্দ্রসংগীতের পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে এমন কিছু পাণ্ডুলিপি রয়েছে যেগুলো আংশিক। অর্থাৎ, সেগুলি স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ গান নয়, গদ্যে ব্যবহৃত গানের অংশবিশেষ। যেমন, ‘জীবনস্মৃতি’র পাণ্ডুলিপির [Ms146(1)] ‘আমেদাবাদ’ অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “শাহিবাগে জজের বাসা ছিল। ইহা বাদশাহদের আমলের প্রাসাদ-ঔরঙজেবের জন্য ইহা নির্মিত হইয়াছিল। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীর শোভা সম্বোগ করিবার জন্য প্রাসাদের সম্মুখভাগেই প্রকান্ত একটি ছাদ আছে। এগারোটার সময় মেজদাদা আদালতে চলিয়া গেলে আমি এই প্রাসাদের বিচিত্র পথ দিয়া বিচিত্র কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম;- সকলের উপরের তলায় একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রম ছিল। রাত্রেও আমি সেই নিজ্জন ঘরে শুইয়া থাকিতাম। শুরূপক্ষের কত নিস্তন্ধরাতে আমি সেই নদীর দিকের প্রকান্ত ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এইরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন খুসি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম - তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

‘নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়

ধীরে ধীরে অতিধীরে অতিধীরে গাওগো!

ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,

রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!’

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্রহন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম – কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে, সেই সাবরমতী নদী তীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর কিছুই ছিলনা। ‘বলি ও আমার গোলাপবালা’- গানটা এমনি আর একরাশে লিখিয়া বেহাগসুরে, বসাইয়া গুনগুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইয়াছিলাম! ‘শুন, নলিনী খোলো গো আঁখি’ ‘আঁধার শাখা উজল করি’ প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।...”

‘বলি ও আমার গোলাপবালা’ সম্পর্কে ‘জীবনস্মৃতি’র অন্য পাণ্ডুলিপির [Ms146(3)] ‘আমেদাবাদ’ অংশে আবার লিখছেন, “...এই শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রম ছিল। কেবল একটি চাকভরা বোলতার দল আমার এই ঘরের অংশী। রাতে আমি সেই নির্জন ঘরে শুইতাম- একেকদিন অন্ধকারে দুই একটা বোলতা চাক হইতে আমার বিছানার উপর আসিয়া পড়িত- যখন পাশ ফিরিতাম তখন তাহারাও প্রীত হইত না এবং আমার পক্ষেও অপ্রীতিকর হইত। শুক্লপক্ষের গভীর রাতে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহারমধ্যে ‘বলি ও আমার গোলাপবালা’ গানটি এখনো আমার কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে। ...” ‘বলি ও আমার গোলাপবালা’ গানটি রচনার বিষয়ে ‘জীবনস্মৃতি’র প্রচলিত মুদ্রিত পাঠে আমরা এই বর্ণনাই পাই। কিন্তু ‘জীবনস্মৃতি’র পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপির [Ms146(1)] বর্ণনা এবং ‘নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়’, ‘শুন, নলিনী খোলো গো আঁখি’, ‘আঁধার শাখা উজল করি’ গানগুলির রচনার প্রেক্ষাপট উক্ত পাণ্ডুলিপির পাতাতেই বন্দি থেকে গেছে, মুদ্রিত পাঠ হিসেবে প্রকাশিত হয়নি।

আবার ‘জীবনস্মৃতি’র Ms146(1) সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ৩১ সংখ্যক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ‘গহনকুসুমকুঞ্জ-মাঝে’ গানটি রচনার বিষয়ে লিখছেন, “...একদিন মেঘলা দিনের মধ্যাহ্নে বাড়ির ভিতরের একটি ঘরে বিছানার উপরে একটি স্লেট লইয়া বসিয়া লিখিলাম— গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে। লিখিয়া বিশেষ গর্ববোধ হইল। তাহার পর হইতে ভানুসিংহের কবিতায় আমার একটি ক্ষুদ্রখাতা ভরিয়া উঠিতে লাগিল...।’ ‘জীবনস্মৃতি’রই অন্য পাণ্ডুলিপিতে [Ms146(3)] পরিমার্জন করে আবার লিখলেন, ‘...একদিন মেঘলাদিনের মধ্যাহ্নে বাড়িভিতরের এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম—গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে। লিখিয়া ভারি খুসি হইলাম—তখনি এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম, বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল—‘বেশ ত, এত বেশ হইয়াছে!’” উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলির রচনার কাল স্পষ্টত জানা না গেলেও Ms146(3)-এর ১০৬ পৃষ্ঠায় ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ অংশের ওপরের অংশে তারিখ দেওয়া রয়েছে ‘বৈশাখ ১৩১৯’। ‘গহনকুসুমকুঞ্জ-মাঝে’ কিম্বা ‘বলি ও আমার গোলাপবালা’, ‘নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়’, ‘শুন, নলিনী খোলো গো আঁখি’, ‘আঁধার শাখা উজল করি’ প্রভৃতি আরও অনেক গানের এই আংশিক পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে আমরা গানগুলির রচনার প্রেক্ষাপট বিষয়ে জানতে পারি। তাই রবীন্দ্রসংগীতের পাণ্ডুলিপির রূপ-রূপান্তরের বিশ্লেষণে গদ্যে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের গানের এই আংশিক পাণ্ডুলিপিগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রসংগীতের পাণ্ডুলিপিগুলির প্রত্যেকটির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি গান ঠিক কোন ভাবনায় রচিত সে বিষয়টিও আমাদের কাছে স্পষ্টতর হবে। তবে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে ডিজিটাইজড ফর্মে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলির অনেক স্থানে মূল পাণ্ডুলিপিরই জীর্ণতা বজায় থেকেছে। সেক্ষেত্রে পাঠ গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেকসময় কবি নিজেই পাণ্ডুলিপির পাতায় কলম দিয়ে এমন ভাবে কেটেছেন যে, পাণ্ডুলিপির গানের পূর্বপাঠটি উদ্ধার করা কঠিন হয়ে যায়। পাণ্ডুলিপিতে কবিকৃত কাটাকুটিগুলির মধ্যে থেকে গানের পূর্ব পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে গানগুলির রচনার কাল ও তার পটভূমিকা উদ্ঘাটন করা সম্ভব। পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন কপিগুলি পাঠ করতে গিয়ে লক্ষ্য করা

যায় যে, কবির প্রথম নির্মাণটি শিল্পগত দিক থেকে কোনো অংশেই কম নয়, তবুও কবি সেই রচনাকে বারবার ভেঙে উদ্ভিষ্ট পথে এগোতে থাকেন। যেহেতু একই গানের বহু পাঠ কবির স্বহস্তেই লেখা পাওয়া যায়, তাই কোন মানসিক অবস্থান থেকে কবি তার পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন এবং তার ফলে পাণ্ডুলিপিটির শিল্পগত রূপের কি পরিবর্তন ঘটছে, পাণ্ডুলিপি পাঠের মাধ্যমে তা অনুধাবন করা সম্ভব। অন্যের দ্বারা অনুলিখিত গানগুলিতে কবি নিজে বহুল পরিবর্তন করেছেন। এই সংযোজন, বর্জন ও পরিবর্তন চলেছে প্রফের পাতাতেও, তাই আমাদের দেখতে হবে যে কবিকৃত পরিশোধিত অংশগুলি সম্পাদক কতখানি গ্রহণ করেছিলেন, এক্ষেত্রে নতুন তথ্যের উঠে আসা সম্ভব বলে মনে হয়। তাই রবীন্দ্রসংগীতের পাণ্ডুলিপির সুক্ষ্ম পর্যালোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপি পাঠের মাধ্যমেই রবীন্দ্রসংগীতের সৃজন ও নির্মাণের ধারাটি স্পষ্টত বিস্লেষণ করা সম্ভব নয়। প্রকাশিত পাঠের বিভিন্ন সংস্করণেও গানের পরিপূর্ণ রূপদানের চেষ্টা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গত দুটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—

‘জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত’ এবং ‘জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত এল, এল’ গান দুটির পাঠগত প্রভেদ থাকলেও বিষয়গত মিল লক্ষণীয়। প্রথমোক্ত গানটির একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি- Ms.210(মায়ার খেলা)পৃষ্ঠা ৪। পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লিখিত নয়। অপরদিকে দ্বিতীয় গানটির দুটি পাণ্ডুলিপিই (MsF মায়ার খেলা, পৃষ্ঠা ৪ এবং MsF গীতবিতান, পৃষ্ঠা ২৩) রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত। ‘গীতবিতান’-এ এই গান দুটি আলাদা আলাদা ভাবে স্বতন্ত্র গান হিসেবে সংকলিত হলেও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী’তে কেবলমাত্র ‘জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত’-এর উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে ‘জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত এল, এল’ প্রসঙ্গে ‘গীতবিতান’-এর গ্রন্থপরিচয় অংশে মুদ্রিত আছে- “নৃত্যনাট্য ‘মায়ার খেলা’র মহলা উপলক্ষে, ‘জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত’ (পৃ. ৬৫৬ ও ৯১৬) গানটিতে বহুবিধ পরিবর্তন করিয়া বর্তমান গানটির রচনা হয়।”^৪ কিন্তু এই একটি গান থেকে আরেকটি নতুন স্বতন্ত্র গানের সৃজনের ইতিহাস পাণ্ডুলিপির পাতায় পাওয়া যায়না। সেক্ষেত্রে গান দুটির মুদ্রিত পাঠের অপর নির্ভর করতে হয়। পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থে বিকশিত হবার পর অনেকক্ষেত্রেই মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের বা পরবর্তী সংস্করণের নানান প্রভেদ লক্ষিত হয়, যা অনেকক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। এই বিভ্রান্তির দিকটি সমালোচনার দাবি রাখে।

পাণ্ডুলিপির অথবা প্রকাশিত পাঠের প্রেস কপির মধ্যে কবি যে পরিবর্তনগুলি করেছেন তার কারণ হিসেবে সম্ভবত কবিসত্ত্বার আত্মবিকাশের কারণই প্রধান। এছাড়াও কবি সম্পাদকের বা গুণী পাঠকের অনুরোধেও কিছু পরিবর্তন করে থাকতে পারেন। অনেকক্ষেত্রে গানের পাণ্ডুলিপিতে সুর সংযোজনের সময় শব্দের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়েছে বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে তাঁর স্বহস্তকৃত পাণ্ডুলিপি, অন্যের দ্বারা অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি ও প্রেস কপির মধ্যে সংযোজন, বর্জন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এবং গানগুলির সম্পাদকীয় দিকটি পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করে মনে হয় যে, এমন পাঠভেদ থেকে থাকতে পারে যা এখোনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত। কবি বা লেখক বহু দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে পাণ্ডুলিপির অলিগলি টপকে ছাপা অক্ষরে প্রকাশ করেন তাঁর বাণীকে। এই বাণী শাস্বত, আর এই বাণীর রচনাকার যখন রবীন্দ্রনাথ, তখন পাণ্ডুলিপির পাতা থেকে অর্থাৎ সৃজন থেকে ছাপার অক্ষরে পরিপূর্ণতা লাভের অর্থাৎ নির্মাণের যাত্রাপথের গবেষণামূলক বিশ্লেষণ হওয়া সময়ের দাবি বলে মনে হয়।

উল্লেখপঞ্জী

- ১। রাজা (দ্বিতীয় সংস্করণ) । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পৃ. ৯
- ২। অরুপরতন (পুনর্লিখিত সংস্করণ) । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পৃ. ৭-৮
- ৩। Ms= Manuscript
- ৪। গীতবিতান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । গ্রন্থপরিচয়, পৃষ্ঠা ১০০৬

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ:

- ১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । অরুপরতন । বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় । কলিকাতা । পুনর্লিখিত সংস্করণ কার্তিক ১৩৪২ ।
- ২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । গীতবিতান (অখণ্ড) । বিশ্বভারতী । কলিকাতা । পৌষ ১৩৮০ ।
- ৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । জীবনস্মৃতি । বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ। কলিকাতা ১৭ । সাধারণ সংস্করণ । জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭
- ৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । রাজা । ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড । এলাহাবাদ । দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩২৭ ।

পাণ্ডুলিপি :

- ১) MsF গীতবিতান।
- ২) MsF বলাকা।
- ৩) MsF মায়ার খেলা । ৪) Ms. 65 (1) (শাপমোচন)।
- ৫) Ms.131 (গীতালি, ফাল্গুনী, বলাকা, শোধবোধ)।
- ৬) Ms.143 (রাজা)।
- ৭) Ms.146 (1) (জীবনস্মৃতি) ।
- ৮) Ms.146 (2) (জীবনস্মৃতি) ।

৯) Ms.146 (3) (জীবনস্মৃতি) ।

১০) Ms.148 ('রাজা)।

১১) Ms.210 (মায়ার খেলা)।

১২) Ms.252 (সিংহলে শাপমোচন)।

১৩) Ms. 427 (ii) [Photocopy of Gitanjali (Bengali and Others Poems of Songs of গীতবিতান, গীতালি etc. / from K.M. Sen Collection)]

সহায়ক গ্রন্থ :

১) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। কলকাতা। সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪১০।

২) Catalogue-in-Progress Vol. 14 . Rabindra-Bhavana Santiniketan.. May 2006.

অভীক সরকার

গবেষক, সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী।

Phone/WhatsApp: 8918954742

E-mail: aveeksarkar16@gmail.com